29

দৈনিক খবর

তারিখ 28 APR 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

পরীক্ষা পদ্ধতি প্রসঙ্গে

এসএসসি পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন সম্পর্কে আবারও কথা উঠেছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত সংবাদ সূত্রে জানা যায়, সরকার পরীক্ষা পদ্ধতি আবারও পরিবর্তনের চিন্তা-ভাবনা করছেন। তবে আভাস পাওয়া গেছে যে, প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন হবে না। রচনামূলক এবং নৈর্ব্যক্তিক উভয় ধারার প্রশ্নই যথারীতি বহাল থাকবে। থাকবে না শুধু নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্যে বেঁধে দেয়া ৫শ' নম্বরের প্রশ্ন ব্যাংক। অর্থাৎ ৫শ' প্রশ্ন এবং নম্বরের প্রশ্ন ব্যাংক তুলে দেয়া হবে। পাশাপাশি প্রত্যেকটি বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক অংশে আলাদা-আলাদাভাবে পাস পদ্ধতি চালুরও নাকি চিন্তা-ভাবনা চলছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা। এই নিবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, উল্লেখিত উপায়ে এসএসসি পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হবে।

শিক্ষা তথা জাতির সামগ্রিক স্বার্থে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষা পদ্ধতি যতদূর সম্ভব ত্রুটিমুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত হওয়া দরকার। পরীক্ষা হচ্ছে ছাত্রদের মেধা যাচাইয়ের একটা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় যদি কোন প্রকার ফাঁক বা গলদ থাকে তাহলে শিক্ষার্থীদের যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। এতে লেখাপড়ার প্রকৃত উদ্দেশ্যই বানচাল হয়ে যেতে পারে। তাই শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষা পদ্ধতি হওয়া চাই ত্রুটিমুক্ত, যাতে শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই এবং শিক্ষার মান বজায়ের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি না হয়।

এ চিন্তা-ভাবনা করেই পূর্বেকার পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করে ১৯৯২ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় রচনামূলক এবং নৈর্ব্যক্তিক এ দুই ধারার প্রশ্ন প্রবর্তন করা হয়। কারণ, পূর্বেকার পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষা ব্যবস্থায় কাঙ্খিত সুফল নিশ্চিত করতে পারেনি। শিক্ষার মান দিন দিনই নীচে নেমে যাচ্ছিলো। হাতে গোণার মত স্বল্পসংখ্যক কেন্দ্র বাদে প্রায় সকল পরীক্ষা কেন্দ্রই নকলের আখড়ায় পরিণত হয়েছিলো। নকল প্রবণতা এত ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিলো যে, গণটোকাটুকি ছাড়া পরীক্ষায় পাস অথবা ভালো ফলাফল করার যে কোন বিকল্প পথ আছে- সে ধারণা শিক্ষার্থীদের মধ্যে একেবারেই লোপ পেতে বসেছিলো। শুধু খারাপ ছাত্র নয়, মধ্যম মানের বিপুলসংখ্যক ছাত্র এমনকি মেধাবী ছাত্রদের একাংশ পর্যন্ত পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে আসক্ত হয়ে উঠেছিলো। আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, একশ্রেণীর শিক্ষক এবং অভিভাবক পর্যন্ত নকলের কাজে শিক্ষার্থীদের ইন্ধন যোগাতো। বাইরে থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল সরবরাহের হিড়িক পড়ে যেতো। কর্তৃপক্ষ নকল রোধের জন্যে কোন প্রকার বাধা দিতে গেলে তাদের প্রায় ক্ষেত্রেই অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হতে হতো। নকল করার অধিকার দাবী করে শিক্ষার্থীরা মিছিল করতো। অর্থাৎ পরীক্ষা ব্যবস্থা একটা প্রহসনে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। যার দরুন মেধা যাচাইয়ের পথ হয়ে যায় রুদ্ধ এবং শিক্ষার মানও দ্রুত নীচে নেমে যেতে থাকে।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে সাবেক সরকারের আমলে এসএসসি পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিটি বিষয়ে ৫০ নম্বর রচনামূলক এবং ৫০ নম্বর নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্যে ধরা হয়। এছাড়া রচনামূলক এবং নৈর্ব্যক্তিক উভয় ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে পাসের বিধান রাখা হয়। কিন্তু ১৯৯১ সালে পরিবর্তিত এই পরীক্ষা পদ্ধতির কতিপয় ক্ষেত্রে সংশোধনী দাবী করে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে দেয়। ছাত্রদের আন্দোলন এবং দাবীর মুখে সরকার এরশাদ আমলে গৃহীত পরীক্ষা পদ্ধতি কিছুটা সংশোধন করেন। এই সংশোধনীতে অংক বাদে অন্য সকল বিষয়ে রচনামূলক এবং নির্ব্যক্তিক প্রশ্নের ধারা বজায় রাখা হয়। এ দু'টি ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে পাসের বিধান রহিত করে দুই অংশ মিলিয়ে ৩৩ শতাংশ নম্বরকে ধরা হয় পাসের ন্যূনতম নম্বর। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের চাপের মুখে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্যে ৫০০ নম্বরের প্রশ্ন ব্যাংক নির্দিষ্ট করে দিতেও কর্তৃপক্ষ বাধ্য হন।

১৯৯২ সালে নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসারে যে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তার ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর দেখা যায়, পাসের হার পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় অনেক বেশী। স্টার পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও অগণিত। আগে যে সমস্ত স্কুল থেকে সচরাচর কোন ছাত্র স্টার মার্ক পায়নি সেসব স্কুল থেকেও অনেকে স্টার মার্ক বাগিয়ে নিলো। অনেকে ব্যাপারটিকে সহজভাবে নিতে পারলেন না। কেউ কেউ ভর্ৎসনা করলেন নতুন পরীক্ষা পদ্ধতিকে। কেউ বললেন, আগের পদ্ধতিই ভালো ছিলো। কেউ কেউ অবশ্য এ কথাও বললেন- পদ্ধতির দোষ নয়, প্রয়োগের দোষ।

এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, পরীক্ষা পদ্ধতির মত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে হুট করে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক নয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে, পূর্বেকার পরীক্ষা পদ্ধতিতেও যথেষ্ট ত্রুটি ছিলো এবং বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিও যে ত্রুটিমুক্ত এমন দাবী করার সময় এখনও আসেনি। কারণ, পরীক্ষায় নকল প্রবণতা রোধ করার যে মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে '৯২ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন প্রর্বতন করা হয় সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। গত বছরও হাজার হাজার পরীক্ষার্থী নকলের অভিযোগে বহিষ্কৃত হয়েছে। চলতি এসএসসি পরীক্ষায় এ পর্যন্ত যে ক'টি বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে সে ক্ষেত্রেও দেখা গেছে বহু পরীক্ষার্থী নকলের অভিযোগে বহিষ্কৃত হয়েছে। বেশ কিছুসংখ্যক শিক্ষককেও পরীক্ষা কেন্দ্রে অসদুপায় অবলম্বনে সহায়তা করার জন্যে কেন্দ্র থেকে বের করে নেয়া হয়েছে। গতবারও এমন ঘটনা ঘটেছে। এবারও ঘটছে। আগামীতেও হয়তো ঘটবে। সুতরাং, পদ্ধতি পরিবর্তন করলেই যে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এমন আশা পোষণের কোন সুযোগ নেই। তাই পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন অথবা সংশোধন যাই হোক না কেন, সব দিক ভেবে-চিন্তে অভিজ্ঞজন এবং শিক্ষাবিদদের সুচিন্তিত মতামত নিয়েই তা করা উচিত। একবার এটা, আরেকবার ওটা- এভাবে সিদ্ধান্ত বার বার পরিবর্তন করা কারও জন্যে মঙ্গলদায়ক নয়। আমরা যতদূর বুঝি, পরীক্ষা পদ্ধতি স্থির করার আগে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ব্যাপারটি খতিয়ে দেখা উচিত। অর্থাৎ স্কুলগুলোতে পড়াশোনার অনুকূল পরিবেশ আছে কি-না সেটা দেখা দরকার। অভিযোগ আছে যে, অনেক স্কুলেই প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক নেই। শিক্ষা উপকরণের অভাব, ল্যাবরেটরী বা লাইব্রেরীর অভাব- এগুলো প্রায় প্রতিটি স্কুলেরই সমস্যা, যার কোন প্রতিকার না থাকায় যথাযথ শিক্ষাদান সম্ভব হয় না। এসব সমস্যার প্রতিকার না করে পরীক্ষা পদ্ধতিতে যত পরিবর্তনই আনা হোক- তাতে কোন ফায়দা হবে না।